

ব্যাংকের সুদ কি হালাল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সূচি ও বিবরণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুস্তাক আহমাদ কারীমী

অর্থনৈতিক ক্ষতি

জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক দিয়েও সুদের অপকারিতা এত বেশী যে, রাজনীতিবিদ এবং অর্থনীতিজ্ঞ বড় বড় পন্ডিতগণ এ কথা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সারা বিশ্ব আজ যে সকল সংকটের সম্মুখীন তার পশ্চাতে রয়েছে সুদের হাত। তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে, বিশ্বের অর্থ-ব্যবস্থা কখনই সফলতা অর্জন করতে পারে না; যদি না সুদী কারবারকে শূন্যের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়; অর্থাৎ সুদকে তার মূল ও বুনিয়াদ থেকে নির্মূল করে উৎখাত না করা পর্যন্ত অর্থনৈতিক সফলতা আদৌ সম্ভব নয়।

এক অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ সত্যই বলেছেন, সুদ অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে ‘এডস’ এর মতই; যে তার প্রতিকার-ক্ষমতায় ঘুণ ধরিয়ে দেয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস ও বিনাসের অতল-গর্ভে তলিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য সেই আমেরিকা, যে পুঁজিবাদের সর্বাপেক্ষা বড় পতাকাধারী এবং প্রধান সমর্থক সে বর্তমানে ভীষণভাবে অর্থনৈতিক সংকটের শিকার হয়ে পড়েছে। আমেরিকা সংবাদ-সংস্থা এই খবর প্রকাশ করেছে যে, আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা বর্তমানে ১২ মিলিয়ন থেকেও বেশীতে গিয়ে পৌঁছেছে। সন ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ২৫৩০০ থেকেও বেশী কোম্পানী নিজেদের দেউলিয়া হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আর জার্মানে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮২ সনে অর্থনৈতিক বাজার মন্দা তথা মুদ্রাস্ফীতির কারণে নিরিখ বা বাজার দর ১১.৯১৬ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যা ১৯৮১ সনের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশী! [1]

জেফরী মার্ক তাঁর ‘আধুনিক পৌত্তলিকতা’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ‘এ কথা সংযোজন করা জরুরী মনে করি যে, সেই সকল ঐতিহাসিকগণ যাঁরা সুদী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অভিনব গণতন্ত্রের স্বার্থে ইতিহাস রচনা করেন তাঁরা এই ঘটনাটিকে মিথ্যা রটনায় পরিণত করেছেন।’

যে মিথ্যা রটনার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তা হল (ফরাসী বীর সম্রাট) নেপোলিয়ন বেনাপার্টের পরাজয়। বলা বাহুল্য লেখক যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তা হল এই যে, নেপোলিয়নকে যে শক্তি পরাজয়ের শিকার করেছিল, তা হল কেবলমাত্র সুদখোরদের আধিপত্য ও ক্ষমতাশীল প্রভাব। [2]

আসুন এবার আমরা সমীক্ষা করে দেখি যে, সুদের অর্থনৈতিক অপকারিতা কি কি?

সাধারণতঃ ঋণ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকেঃ

- ১- কিছু ঋণ যা, অভাবী লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করে থাকে।
- ২- কিছু ঋণ, যা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সওদাগরগণ নিজেদের মুনাফাজনক কাজে খাটাবার জন্য নিয়ে থাকে।
- ৩- কিছু ঋণ, যা সরকার নিজের দেশবাসীর নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে। যা যুদ্ধের সময় অথবা রেলপথ, বিদ্যুৎ-পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যকর করার নিমিত্তে তা গ্রহণ করা হয়।

৪- কিছু ঋণ, যা সরকার নিজের প্রয়োজনে কোন অন্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে নিয়ে থাকে।

এবার আমরা প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক-পৃথক সমীক্ষা করে দেখব যে, সুদ আরোপিত হওয়ার পর কি কি ক্ষতি তাতে নিহিত রয়েছে:-

১- অভাবী লোকেদের ঋণঃ

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী যে কারবারের মাধ্যমে সুদ লেন-দেন হয়, তা হল মহাজনী কারবার (LENDING BUSINESS)। এই আপদ কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি একটি বিশ্বব্যাপী আপদ; যে আপদ থেকে কোন দেশই মুক্ত নয়। এর কারণ এই যে, গরীব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের নিজ প্রয়োজনে সহজভাবে ঋণ লাভের ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন স্থানেই নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক দেশেরই মজুর, চাষী, ছোট-খাটো কারবারী, ব্যবসায়ী এবং অল্প বেতনভূক চাকুরীজীবী মানুষেরা বাধ্য হয়েই নিজেদের দুর্দিনের সময় ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু উক্ত মহাজনী কারবারে সুদের হার এত বেশী আকারে প্রচলিত যে, যখনই কোন ব্যক্তি একবার এসে এ সুদী ঋণের জালে ফেঁসে যায়, তখন সে আর নিজেকে সেখান হতে উদ্ধার করতে সক্ষম থাকে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি শেষে এই দাঁড়ায় যে, দাদার গৃহীত ঋণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পোতাদের ঘাড়ে চেপে বসে। এই মহাজনী কারবারে ইংল্যান্ডে সরকারীভাবে সুদের বাৎসরিক হার হল শতকরা ৪৮ ভাগ এবং বেসরকারী বাজারে ২৫০ থেকে ৪০০ ভাগ! আমেরিকায় সরকারীভাবে শতকরা ৩০ থেকে ৬০ ভাগ এবং বেসরকারী বাজারে ১০০ থেকে ২৬০ শতাংশ। অনেক সময় এ সুদের হার ৪৮০ শতাংশতেও পৌঁছে থাকে। আর আমাদের নিজের দেশ ভারতবর্ষেই বাৎসরিক ৭৫ শতাংশ হারে সুদ প্রচলিত যা অনেক সময় ১৫০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

বরং বাৎসরিক ৩০০ থেকে ৩৫০ শতাংশ হারে সুদের দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে।

প্রত্যেক দেশের গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরাট সংখ্যক লোক এই মহা আপদজালে মারাত্মকভাবে জড়িত। দিবারাত্রি বিরামহীন পরিশ্রমের পর যে সামান্য বেতন বা মজুরী তারা হাতে পায় তা থেকে সুদ আদায় করার পর তাদের নিকট দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে আহার করার মত পয়সাও অবশিষ্ট থাকে না। এর ফলে উক্ত পরিস্থিতি ঐ শ্রেণীর মানুষদের শুধুমাত্র চরিত্র নষ্ট ক'রে, অপরাধ-প্রবণতার দিকে ঠেলে দিয়ে, তাদের জীবন-যাপনের মান নিম্নমুখী ক'রে এবং তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার মান অনুন্নত করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং তার চূড়ান্ত পরিণাম এও যে, দুশ্চিন্তা ও কষ্ট-ক্লেশ দেশের সাধারণ কর্মশীল মানুষদের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতাকে বহুলাংশে হ্রাস ক'রে দেয়। পরন্তু যখন তারা নিজেদের মেহনতের ফল অপরকে ভোগ করতে দেখে, তখন তাদের নিজেদের কাজের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এই দিক থেকে সুদী কারবার কেবলমাত্র এক প্রকার যুলুমই নয়; বরং তা সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার পক্ষেও ভয়ানক ক্ষতিকর। যার সরাসরি প্রভাব পড়ে রুজী-রোজগার সম্পর্কিত উৎপাদনের উপর। আর ভাববার কথা এই যে, যদি পৃথিবীর ৫ কোটি মানুষও মহাজনী সুদজালে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা গড়ে মাসিক ১০ টাকা হারে সুদ আদায় করতে থাকে, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, প্রতি মাসে ৫০ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য অবিক্রিত অবস্থায় থেকে যাবে। আর এই বিপুল পরিমাণের অর্থ জীবন-জীবিকামূলক উৎপাদনের দিকে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে অতিরিক্ত সুদী ঋণ সৃষ্টির পশ্চাতে মাসের পর মাস ব্যয়িত হবে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মহাজনী ঋণ কমপক্ষে ১০০০ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছিল। (এবারে সারা বিশ্ব জুড়ে এ ধরনের ঋণের পরিমাণ এবং এ ঋণ বাবদ মহাজনদের ঘরে আসা সুদের পরিমাণ কত তা অনুমেয়।)

1. বাণিজ্যিক ঋণ

যে ঋণ ব্যবসা, শিল্পোন্নয়ন এবং অন্যান্য বিভিন্ন কাজ-কারবারে খাটাবার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয় তার উপর সুদ গ্রহণ করাকে বৈধ প্রমাণ করার প্রেক্ষিতে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি পরিদৃষ্ট হয় তা একটু ঠান্ডা মাথায় পড়ুন।

পুঁজিপতিরা অংশীদার হিসাবে নিজেদের পুঁজি কোন ব্যবসায় খাটাবার পরিবর্তে ঋণদাতা হিসাবে ব্যবসায়ীদেরকে এ পুঁজি ঋণ-স্বরূপ প্রদান করে তা থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে নিজেদের সুদ আদায় করে থাকে। জীবিকা- সংক্রান্ত উৎপাদনকে উন্নত করার ব্যাপারে তাদের কোন প্রকারের আগ্রহ ও উদ্যম থাকে না। কারণ তারা তা করুক চাই না করুক সর্বাবস্থায় তাদের মুনাফা তো নির্দিষ্ট আছেই। কারো ব্যবসায় যদি নোকসান হয় তবুও তাদেরকে কোন চিন্তা স্পর্শই করে না। কারণ তাদের জন্য মুনাফা থাকে সুনিশ্চিত। ধরে নিন, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে এক ব্যক্তি ২০ বছরের মেয়াদে ৭ শতাংশ হারে একটি মোটা অংকের অর্থ ঋণ নিয়ে কোন একটি বড় ব্যবসা শুরু করল। এখন সে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নিয়মিতভাবে উক্ত হারে আসল টাকার কিস্তি সহ সুদ আদায় করতে বাধ্য। চুক্তি হয়েছিল ১৯৭০ সালে। কিন্তু ১৯৭৫ সাল পৌঁছতে পৌঁছতে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়ে যদি আগের মূল্যের অর্ধেকের এসে ঠেকে, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, এই ব্যবসায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি শুরু হওয়ার সময়কালের তুলনায় বর্তমানে (১৯৭৫ সালে) দ্বিগুণ পণ্য বিক্রয় না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে না তার সুদ আদায় করতে সক্ষম হবে, আর না আসল কিস্তি দিতে পারবে। এর অনিবার্য পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, এ চড়া মূল্যের সময়কালে এ ধরনের অধিকাংশ ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যাবে, নতুবা দেউলিয়ার হাত থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা বিনষ্টকারী অবৈধ কোন কর্ম করে বসবে।

এ ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আপনি নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত হবেন যে, বিভিন্ন সময়কালে ওঠানামাকারী দ্রব্যমূল্যের মাঝে ঋণদাতা এ পুঁজিপতির সেই সকল মুনাফা যা সর্ব অবস্থা ও সময়ের জন্য এক সমান ও নির্দিষ্ট থাকে, তা অবশ্যই ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গত নয় এবং অর্থনীতির দৃষ্টিকোণেও তা কোনক্রমেই যথার্থ বিবেচিত হবে না।

৩- রাষ্ট্রের বেসরকারী ঋণ

সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশের সরকার লাভজনক কাজ-কর্মে লাগানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু কোন সরকারই একটি নির্দিষ্ট হারে সুদের উপর ঋণ নেওয়ার সময় এ কথা জানতে পারে না যে, আগামী ২০/৩০ বছরের ভিতরে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বিশেষর আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত অবস্থা কোন্ দিকে মোড় নেবে এবং সেই সঙ্গে যে কাজে ব্যয় করার জন্য সে এই সুদী ঋণ নিচ্ছে তাতে মুনাফা অর্জনের পরিমাণ ও অবস্থা কিরূপ থাকবে। অধিকাংশ সময়ে সরকারের অনুমান ভুল প্রমাণিত হতে দেখা যায়। সুদের হার অপেক্ষা বেশী হওয়া তো দূরের কথা সমপরিমাণ মুনাফা লাভও সম্ভবপর হয় না। এবারে পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে, সরকার তার এ সুদের সাধারণ বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। ট্যাক্সের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির পকেট থেকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ঐ সুদের টাকা অসূল করে নেওয়া হয় এবং বছরের পর বছর লাখো লাখো টাকা জমিয়ে পুঁজিপতিদের নিকট দীর্ঘ সময়কাল যাবৎ পৌঁছানো হয়ে থাকে।

মনে করুন, আজ ৫ কোটি টাকার একটি সেচ-প্রকল্প কার্যকরী করা হল। আর এ কাজে ব্যয়িতব্য পুঁজি বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সংগ্রহ করা হয়েছে। এবারে এই হিসাবে সরকারকে প্রতি বছর ৩০ লাখ টাকা সুদ আদায় করতে হবে। বলা বাহুল্য, সরকার এত বড় অংকের টাকা কোথাও মাঁটি খুঁড়ে বের করে আনবে না। বরং বোঝাটি

সেই চাষীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে যারা ঐ সেচ-প্রকল্পের পানি থেকে লাভবান হবে। প্রত্যেক চাষীর উপর যে সেচকর আরোপ করা হবে, তাতে অবশ্যই ঐ সুদের অংশও থাকবে। আর চাষীরা নিজেরাও ঐ সুদ তাদের পকেট থেকে দেবে না; বরং তার সে অর্থ তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের দাম থেকে বের করে নেবে। এইভাবে উক্ত সুদ পরোক্ষভাবে প্রত্যেক সেই ব্যক্তির নিকট থেকে অসূল করা হবে, যে ঐ চাষীদের উৎপাদিত শস্য ব্যবহার করবে। আর অনুরূপভাবে প্রত্যেক গরীব ও দুঃখী ব্যক্তির রুটি থেকে এক টুকরা অথবা ভাতের বাসন থেকে এক মুঠো ভাত কেড়ে নিয়ে এ পুঁজিপতিদের বিরাট উদরে ঢেলে দেওয়া হবে; যারা বার্ষিক ৩০ লাখ টাকা সুদের ভিত্তিতে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে ঋণ দিয়েছিল। যদি সরকারকে এ ঋণ পরিশোধ করতে ৫০ বছর লেগে যায়, তাহলেও সে গরীবদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেই ধনীদেরকে পুষ্ট করার এ দায়িত্ব অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত নিয়মিত পালন করে যেতে থাকবে।

এমন কর্মপদ্ধতি সামাজিক অর্থ-ব্যবস্থায় ধনের প্রবাহকে ধনহীনদের নিকট থেকে সরিয়ে ধনবানদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। অথচ সামাজিক কল্যাণ ও সফলতার উদ্দেশ্যে উচিত ছিল, ধন-মালের এ প্রবাহ ধনবানদের নিকট থেকে ধনহীনদের দিকে বহমান থাকা। এ অনিষ্টকারিতা কেবলমাত্র সেই সুদেই সীমাবদ্ধ নয় যা সরকার মুনাফাজনক ঋণের উপর আদায় করে থাকে বরং সেই সকল প্রকার সুদী লেনদেনেও তা নিহিত আছে, যা সাধারণতঃ বণিক-সমাজ করে থাকে। বলা বাহুল্য কোন ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা কৃষক পুঁজিপতিকে দেয় সুদ নিজের ঘর থেকে আদায় করে না। তারা সকলেই সেই বোঝা নিজেদের পণ্যের দামের উপর চাপিয়ে দেয় এবং এইভাবে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে এক পয়সা দু' পয়সা করে চাঁদা জমা করে লাখপতি পুঁজি-ওয়ালাদের বুলিতে ঢেলে দেওয়া হয়! এই উল্ট অর্থ-ব্যবস্থায় দেশের সব চাইতে বড় ধনাঢ্য মহাজনই সর্বাপেক্ষা অধিক 'সাহায্য লাভের অধিকারী' হয়। পরন্তু এ সাহায্যদানের দায়িত্ব যাদের উপর সব চাইতে বেশী বর্তায়, তারা হল সেই দরিদ্রশ্রেণীর দেশবাসী, যারা নিজেদের দেহের রক্ত পানি করে যৎসামান্য রোজগার করে আনে। উপরন্তু নিজেদের অভুক্ত সন্তানদের মুখে দু' মুঠো ডাল-ভাত তুলে দেওয়াও তাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর পূর্বেই ঐ ডাল-ভাতের একটা অংশ দেশের সব চাইতে বেশী 'করুণার পাত্র' কোটিপতিদের জন্য বের করে দেয়।[3]

ফুটনোট

[1] (আর রিবা, উমার আশকার ১২৯-১৩০ পৃঃ)

[2] (আর রিবা, ডক্টর উমর আশকার ১৪২-১৪৩ পৃঃ)

[3] (দেখুন, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ৬৮ পৃঃ)